

মামাজিক মূল্যবোধ ও রীতি নীতি

নীলা ক্লাসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর বন্ধুরা ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু নীলার কান্না কিছুতেই থামছে না। এমন সময় খুশি আপা এলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কী হয়েছে নীলা, কাঁদছ কেন?

তাতে নীলার কান্নার বেগ আর একটু বাড়ল কেবল। নীলার বন্ধুরা খুশি আপাকে যা জানাল তাঁর মানে হলো, নীলার বোন নীলার সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের একজন। কয়েক দিন আগে নীলার সেই বোনের বিয়ে হয়েছে, বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। আজ কথা প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস নীলার বোনের কথা জিজ্ঞেস করতেই হঠাৎ করেই নীলা কাঁদতে শুরু করে।

খুশি আপা নীলাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কষ্ট! তোমার দুঃখে আমাদের সবারই অনেক মন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এমন কষ্ট শুধু তোমার একার নয়, আমাদের সমাজে প্রায় সবারই এ রকম কষ্টের অভিজ্ঞতা আছে।

নীলা একটু শান্ত হলে খুশি আপা বললেন, চলো আমরা দলগতভাবে একটা লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ি। আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছরেরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি লিখেছিলেন। এতক্ষণে নীলা কান্না থামিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ছিন্নপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

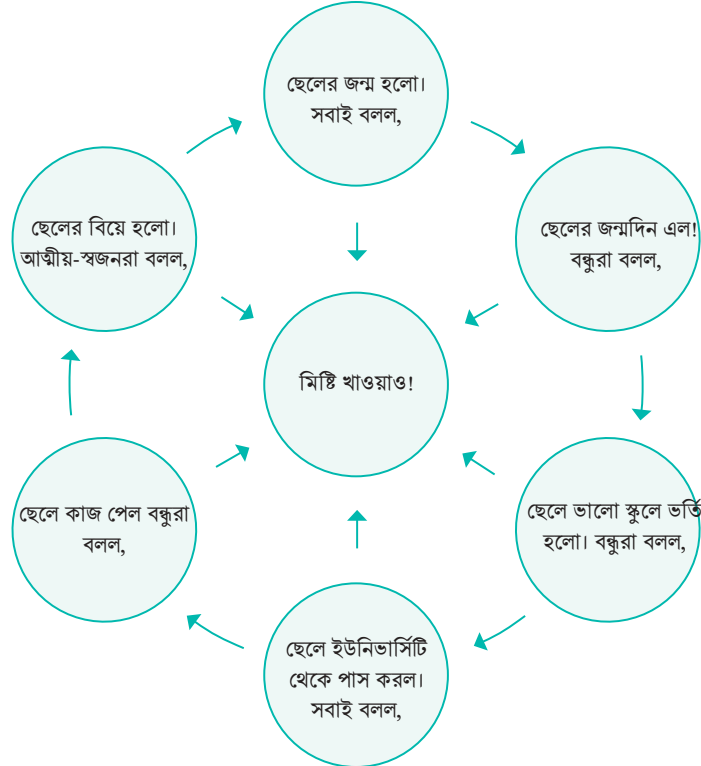
.....বোধ হয় বয়সে বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হুটপুট হওয়াতে চোদপনেরো দেখাচ্ছে। ছেলেদের মতো চুল ছাটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। ...ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারি নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। .. অবশেষে যখন যাত্রার সময় হলো তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল-হাতে-বালা-পরা, উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকায় তুললে। বুঝলুম, বেচারী বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে-নৌকা যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ



মুহুতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব ঐটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চ’ড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে টিপিyeও দিত। সকাল বেলায় সকাল বেলায় রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদের পূর্ণ বোধ হতে লাগল!.. মনে হমল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। ... বিদায়কালে এই নৌকা করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে সেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা সেন মৃত্যুর মতো তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া-যারা দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ...

পড়া শেষে হলে মিলি বলল, এটাতো নীলার বড় বোনের শ্বশুড়বাড়ি চলে যাবার মতো একই রকম ঘটনা মনে হচ্ছে! গল্পের ছোট মেয়েটাও নীলার মতো ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সাবা বলল, আরো কয়েকজন মেয়েও কাঁদছে। রফিক অবাক হয়ে বলল, আচ্ছা, সবাই যখন এত কষ্টই পাচ্ছে, তখন মেয়েটাকে শ্বশুড়বাড়িতে পাঠাচ্ছে কেন! নীলা বলল, আমার বোনের বিয়ের পরে আমিও এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সবাই বলেছে, এটাই নিয়ম। বিয়ের পর মেয়েরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুড় বাড়ি চলে যায়। ওমেরা বলল, সব মেয়েদের তো শ্বশুরবাড়িতে যেতে হয় না! গারো সম্প্রদায়ে, বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের পরে ছেলেরাই মেয়েদের বাড়িতে চলে আসে। বুশরা জিজ্ঞাসা করল, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে এমন ভিন্ন রকম ব্যবস্থা কেন? খুশি আপা বললেন, দারুণ! আলোচনা জমে উঠেছে। তোমরা অসাধারণ কিছু প্রশ্ন তুলেছ! আচ্ছা এসব প্রশ্নে উত্তর খোঁজার আগে চলো আমরা আরেকটা মজার ছবি দেখে নিই।

মিষ্টি খাওয়াও!



খুশি আপা বললেন, এই ছবির মতো ঘটনা কি তোমরা কখনও দেখেছ? ফাতেমা বলল, আমার পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা জন্মেছিল। ওদের বাড়ি থেকে পাড়ার সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল। গণেশ বলল, আমার বড় বোনের পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর বাবা-মা সবাইকে মিষ্টি দিয়েছিল। আয়েশা বলল, আমার ছোট মামা চাকরি পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। খুশি আপা বললেন, এই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা কিন্তু সবগুলো ঘটনার মধ্যে একটা মিল আছে। অশ্বেষা বলল, হ্যাঁ আপা, সবগুলোই আনন্দের খবর। খুশি আপা বললেন, ভালো কিছু হলে অন্যদের ‘মিষ্টিমুখ করানো’ আমাদের সমাজের একটা নিয়ম। এবার চলো একটা মজার কাজ করি।

খুশি আপা ওদের নিচের ছবিগুলো দেখিয়ে জানতে চাইলেন, ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?



ওরা ছবি দেখে বর্ণনা দিল, কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময় করা, বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, মালা বদল, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খাওয়া, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য উঠে দাঁড়ানো, তাঁদের বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া, কারোর সঙ্গে দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলা, বাসায় অতিথি এলে আপ্যায়ন করা।

খুশি আপা: এগুলোও আমাদের সমাজে প্রচলিত নানান নিয়ম। এ রকম আর কোনো নিয়মের কথা কি তোমাদের মনে পড়ছে?

অশ্বেষা: একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া।

মোজাম্মেল: বেদে সম্প্রদায়ে বিয়ের সময় ছেলেদের গাছের উঁচু ডালে উঠে বসে থাকা।

আনাই: সাংগ্রাইয়ের সময় মারমাদের ‘পানি খেলা’।

ফ্রান্সিস: প্রথম পড়া দাঁত বালিশের তলায় রেখে দেওয়া।

সালমা: জন্মদিনে কেক কাটা।

মাহবুব: টয়লেট ব্যবহার করার পর আরো বেশি পরিষ্কার করে রাখা।

হাচ্চা: সবার সামনে বায়ু ত্যাগ না করা।

হাচ্চার কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল! খুশি আপাও হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর বললেন, বাহু, আমরা তো দেশ-বিদেশের অনেক সামাজিক নিয়মের কথাই জানি! এবার চলো, এগুলো নিয়ে একটা মজার কাজ করি। প্রত্যেকে নিচের ছকটা ব্যবহার করে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা

বলে তারা কোন কোন সামাজিক নিয়ম মেনে চলে তার একটি তালিকা তৈরি করি। এসব নিয়ম-কানুন তারা কোথা থেকে জানতে পেরেছেন? নিয়ম না মানলে কী হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তরও জেনে নিই। ছকটিতে উদাহরণ হিসেবে একটি সামাজিক নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যতগুলো খুঁজে পাবে সবগুলো এই তালিকায় যোগ করব আর প্রশ্ন করে উত্তরও জেনে নেব। আমরা আরও বেশি ঘর ঐকে যতগুলো সম্ভব সামাজিক নিয়ম এই তালিকায় যুক্ত করব।

ক্রম	সামাজিক নিয়মের তালিকা	নিয়ম পালনের কথা কে বলে দিয়েছে?/কোথা থেকে জেনেছেন?	এই নিয়ম পালন না করলে কী হতে পারে?
১।	বড়দের শ্রদ্ধা করা	বাবা-মা, বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন	সবাই অপছন্দ করবে। অভদ্র বলবে।
২।		
৩।		
৪।		

কয়েক দিন পর শ্রেণিকক্ষে সবাই অনেকগুলো সামাজিক নিয়মের তালিকা নিয়ে হাজির হলো। খুশি আপা বললেন, অসাধারণ কাজ করেছ তোমরা! সবার উপস্থাপন শেষে বোঝা গেল:

- অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলো জেনেছে তাদের পরিবার, পাড়া-পড়শি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে।
- সবাই জানে, এসব নিয়ম-কানুন মেনে না চললে আইন কোনো শাস্তি দেয় না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ এসব নিয়ম-না-মানা মানুষদের অপছন্দ করে।

এবারে ওপরের ছকটি ব্যবহার করে চলো আমরাও কাজটি করি। নিজেরা দেখে নিই, যাদের কাছে জিজ্ঞেস করে তালিকাটি তৈরি করছি,

- তারা নিজেরা এসব নিয়ম-কানুনের বিষয়ে কী মনে করেন?
- তারা কোথা থেকে নিয়মগুলো পেয়েছেন?
- এসব নিয়ম না মানলে কী হয়?

খুশি আপা এবার বললেন,

সমাজের এই অলিখিত নিয়ম-কানুনগুলোকে সামাজিক রীতি-নীতি বা সংস্কার বলে। সামাজিক রীতি-নীতি আমাদের বলে দেয় কোন পরিস্থিতিতে, কোন পরিবেশে, কার সাথে একজন মানুষকে কী ধরনের আচরণ করতে হবে। এগুলো মেনে চলবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কেউ না মানলে সমাজের মানুষ তাকে অপছন্দ করতে পারে।

শিহান বলল, কিন্তু আমরা যে দেখলাম আমাদের বন্ধু নীলা ও তার পরিবার, এমনকি রবীন্দ্রনাথের গল্পের

মানুষগুলোও রীতি-নীতি মেনে চলতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেল! সাবা বলল, আবার এটাও তো দেখলাম, অনেক রীতি-নীতি আমাদের আনন্দ দিচ্ছে, অনেক উপকারেও লাগছে। যেমন-বড়দের শ্রদ্ধা করা, বসার জায়গা দেওয়া, টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে বের হওয়া ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। সমাজে প্রচলিত কিছু রীতি-নীতি অনুসরণ করা অনেক সময় কষ্টকর আবার অনেক রীতি-নীতি আমাদের জন্য উপকারী। চলো, এবার তাহলে আমরা এতক্ষণ যে কাজগুলো করেছি তা বিশ্লেষণ করি। ভাবনা-চিন্তা করে দেখি, আমাদের সামাজিক রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো কী? সবার আলোচনা থেকে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেল।

সামাজিক রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য

১. সামাজিকভাবে তৈরি হয়।
২. সামাজিক রীতি-নীতি সমাজের একটি অপরিহার্য অংশ।
৩. সামাজিক রীতি-নীতি ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।
৪. একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়/দেশে আলাদা রকমের সামাজিক রীতি-নীতি হতে পারে।
৫. রীতি-নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অলিখিত নিয়ম-কানুন।
৬. সমাজের অধিকাংশ মানুষ চেষ্টা করে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে।
৭. সমাজে নির্দেশমূলক ও নিষেধমূলক এই দুই ধরনের রীতি-নীতি দেখা যায়। নির্দেশমূলক রীতি-নীতি মানুষকে কোনো কাজ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়। আর নিষেধমূলক রীতি-নীতি কোনো কেনো বিশেষ কাজ করতে নিষেধ করে থাকে।

বুশরা বলল, রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য তো বুঝলাম। কিন্তু এগুলো আসলে সমাজে কী কাজ করে সেটা ভালো করে বুঝতে পারছি না। খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আলোচনা করে বুঝে নিই সমাজে সামাজিক রীতি-নীতির ভূমিকা কী।

সমাজে সামাজিক রীতি-নীতির ভূমিকা

১. সমাজে মানুষের আচার ব্যবহার কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়।
২. সমাজের যাতে সবকিছু ঠিকমতো কাজ করে তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে।
৩. মানুষের সমাজ গড়ে তোলার যে মূল উদ্দেশ্য—সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা, তা অর্জনে ভূমিকা রাখে।
৪. সবাই যদি সামাজিক রীতি-নীতি মেনে একই রকম আচার-ব্যবহার চর্চা করে, তাহলে সমাজের প্রতিদিন যে কাজগুলো হয় তা সুষ্ঠুভাবে হতে পারে।
৫. সমাজের মানুষের প্রতিদিনের কাজকর্ম যাতে কমবেশি একই রকম রুটিন অনুযায়ী চলে সে জন্য একটি সাধারণ মান ঠিক করে দেয়।
৬. সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ তৈরি করে।
৭. সামাজিক বিচারে সফলতার মানদণ্ড তৈরি করে মানুষের মাঝে সফলতার অনুভূতি তৈরি করতে সহায়তা করে।

গৌতম বলল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, সমাজে সবাই একই ধরনের রীতি-নীতি বা নিয়ম-কানুন মেনে চলে কেন?

খুশি আপা বললেন, খুবই ভালো প্রশ্ন করেছ। তোমরা যখন এমন সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করো তখন আমার খুব আনন্দ হয়! তারপর রহস্যময়ভাবে একটুখানি হেসে বললেন, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর আমরা আজ খুঁজব না। আগামীকাল আমরা এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কাজ করব।

পরদিন খুশি আপা বেশ উৎফুল্ল মনে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন স্বয়ং প্রধান শিক্ষক এসেছেন। তিনি সবাইকে কিছু একটা বোঝাচ্ছেন। সবার মুখ থমথমে। খুশি আপা ঢুকতেই অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালেও সালমা, রূপা, মামুন, রনি, আদনান, শিহান, অন্বেষা, সুমন, আনাই, গণেশ, সালমা আর ফাতেমা দাঁড়ালো না এমনকি সালাম/নমস্কার/সম্ভাষণ কিছুই জানালো না। উল্টো মুখে দুষ্টুমি ভরা মুচকি হাসি নিয়ে নির্বিকারে বসে থাকলো। প্রধান শিক্ষক মহোদয় তীর হতাশা নিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বললেন, আবারও তোমরা একই কাজ করলে!! শিক্ষককে অসম্মান করলে! এতক্ষণ ধরে তোমাদের যে এত কিছু বললাম তার কিছুই তোমরা বুঝলে না! বিরক্তি নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খুশি আপাকে বললেন, আপনার আগে গণিত, বাংলা আর বিজ্ঞান শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসেছেন। সবাই তাদের সম্মান জানালেও, ঐ যে সামনের দিকে বসা এই কয়জন খুবই অদ্ভুত এবং অসঙ্গত আচরণ করছে আজ। খুশি আপা বিস্তারিত জানতে চাওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহোদয় যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে— সালমা আর রূপা স্কুলের রীতি-নীতি উপেক্ষা করে কড়া লাল রংয়ের লিপিস্টিক দিয়ে এসেছে। মামুন আর অন্বেষা শিক্ষকসহ যারা তাদের কাছে কিছু চাইছে, তারা বাম হাত দিয়ে তা দিয়েছে। বারবার বোঝানোর পরও একই কাজ করছে। জামাল- স্কুলে এসেছে পিঠের দিকে শার্টের বোতাম লাগিয়ে। আর শিহান, রনি, সুমন, আনাই মগিনি, আদনান, সাবা— শিক্ষকদের সালাম/নমস্কার/সম্ভাষণ করেনি, উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানও দেখায়নি। শিক্ষকরা খুবই কষ্ট পেয়েছেন ওদের এ ধরনের আচরণে।

খুশি আপা এবার প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে আশ্বস্ত করে বললেন, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। ওরা সবাই খুব ভালো। যা কিছু করেছে, তা আমার পরামর্শে করেছে। সামাজিক রীতি-নীতি কেন মানুষ মেনে চলে, সেটা হাতে কলমে বোঝার জন্য গতকাল আমি সবার সাথে ওদের এই আচরণগুলো করার পরামর্শ দিয়েছিলাম। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ততা যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য আপনাদেরও বলিনি। সবার সাময়িক অসুবিধার জন্য আমার ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তখন শিক্ষার্থীরাও উঠে দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। প্রধান শিক্ষক মহোদয়ও হেসে সবাইকে শুভ কামনা জানিয়ে চলে গেলেন।

তখন খুশি আপা হাসিমুখে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, চলো, এবার আমরা একটু বিশ্লেষণ করে দেখি, আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে কী পেলাম। তারপর যারা এই কাজে ভূমিকা রেখেছে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতে বললেন। সবার আলোচনা থেকে যা বের হয়ে এলো, সেটাকে তারা নিচের সারণি ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

শিক্ষার্থীর নাম	আচরণের বর্ণনা	প্রতিক্রিয়ার বিবরণ
সালমা, রূপা	স্কুলের রীতিনীতি উপেক্ষা করে কড়া লাল রংয়ের লিপিস্টিক দিয়ে এসেছে	<p>পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী খুবই রাগ করেছেন</p> <p>প্রতিবেশী- ঘর থেকে বের হতেই পাশের বাড়ির চাচির সাথে দেখা। তিনি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছেন, স্কুলে যাচ্ছে না পিকনিকে!</p> <p>রাস্তায়- লোকজন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে।</p> <p>স্কুলে- দারোয়ান ঢুকতে দিতে চায়নি।</p> <p>সহপাঠীরা- হাসাহাসি করেছে। ব্যঙ্গ করেছে।</p> <p>শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।</p>
মামুন, অশ্বেষা	শিক্ষকসহ অন্য যে কেউই যতবারই তাদের কাছে কিছু চেয়েছে তারা বাম হাত দিয়ে তা দিয়েছে	<p>পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী বকা দিয়ে ডান হাতে দিতে বাধ্য করেছেন</p> <p>প্রতিবেশী- বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন যে ডান হাতে কী হয়েছে?</p> <p>সহপাঠীরা- নিষেধ করেছে যেন শিক্ষককে বাম হাতে না দেয়া হয়। তাহলে শিক্ষক রেগে যেতে পারেন।</p> <p>শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। কষ্ট পেয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।</p>
জামাল	স্কুলে এসেছে পিঠের দিকে শার্টের বোতাম লাগিয়ে	<p>পরিবার- বাবা, মা, বড় ভাই-বোন, দাদী প্রথমে হাসাহাসি করেছেন। তারপর রাগ করেছেন।</p> <p>প্রতিবেশী- বাজারে নতুন ফ্যাশন এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে।</p> <p>রাস্তায়- লোকজন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছে। হাসাহাসি করেছে।</p> <p>স্কুলে- দারোয়ান ঢুকতে দিতে চায়নি। বলেছে শার্ট ঠিক করে পরে ঢুকতে হবে।</p> <p>সহপাঠীরা- হাসাহাসি করেছে। ব্যঙ্গ করেছে।</p> <p>শিক্ষকগণ- আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।</p>

শিহান, রনি, সুমন, আনাই মগিনী, গণেশ, সাবা	শিক্ষকদের সালাম/ নমস্কার/সম্ভাষণ করেনি, উঠে দাড়িয়ে সম্মানও দেখায়নি	শিক্ষকগণ- অভদ্র ভেবেছেন। আহত হয়েছেন। হতাশ হয়েছেন। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।
---	---	---

যারা কাজটিতে অংশগ্রহণ করেছে খুশি আপা কৌতুকভরে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কী? তোমাদের কেমন লেগেছে?

সালমা বলল, খুব খারাপ লেগেছে। সবার কথা আর আচরণে মনে হয়েছে আমি খুব খারাপ মেয়ে।

আনাই মগিনী বলল, ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। সবাই আমাদের খুবই অভদ্র ভেবেছে। মামুন আর অঘোষাও একই মতো জানাল। জামাল বলল, সবাই আমাকে হাস্যকর ভেবেছে, খেপানোর চেষ্টা করেছে। মনে হচ্ছিল, কোথাও পালিয়ে যাই। শুধু ভাবছিলাম, কখন শার্টটা সোজা করে পরতে পারব।

রনি বলল, কিন্তু আমরা কেউই হাস্যকর বা বেয়াদব হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি কেন মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে!

সালমা-শিহানদের অভিজ্ঞতাও আলোচনা করে সারণিটি পূরণ করার পর খুশি আপা বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন, এবার তোমরাও কোনো একটা রীতি-নীতি বাছাই করে, পরীক্ষামূলকভাবে দুই এক দিনের জন্য অনুসরণ করে, ওপরের সারণিটা পূরণ করে নিয়ে এসো। তবে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে, অবশ্যই যাতে বাবা বা মা যে কোনো একজনকে ভালোভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে জানিয়ে রাখে। যাতে কোনো সমস্যা হলে তিনি অন্যদের বুঝিয়ে বলতে পারেন।

কয়েক দিন পর সবাই কাজটি শেষ করে ক্লাসে এসে দলগতভাবে তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করল। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেন মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে তার কিছু কারণ তারা খুঁজে বের করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করল। সবার উপস্থাপনা থেকে নিচের কারণগুলো পাওয়া গেল।

কেন মানুষ প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে?

১. রীতি-নীতি নানাভাবে সমাজের মানুষের উপকার করে। উপকারী-রীতি-নীতি সমাজে বিভিন্ন মানুষের সাথে বিভিন্ন পরিবেশে কী ধরনের আচরণ করতে হবে তা শিখতে সহযোগিতা করে। ভালো আচরণ-খারাপ আচরণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়। সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাপনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে।
২. মানুষ সাধারণত পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিচিতজন সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে। তাই সে সবার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়। সমাজের অধিকাংশ মানুষ সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে বলে কারোর যদি রীতি-নীতি নিয়ে কোনো ভিন্নমত থাকে, তবুও সবার মতামত মেনে নেয়।

৩. মানুষ সাধারণত অধিকাংশ মানুষের কাজ বা চিন্তাকে সঠিক মনে করে। কোনো মানুষের পক্ষেই অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ কী তা জানা সম্ভব নয়। মানুষ তার আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের আচরণ ভেবে ভুল করে। ফলে আশপাশের মানুষের আচরণকে অধিকাংশ মানুষের পছন্দের আচরণ ভেবে তাদের আচরণ বা রীতি-নীতি মেনে চলে।
৪. মানুষ সাধারণত দলে চলতে পছন্দ করে। একটা দলের সামনের অংশ যেদিকে যায়, পেছনের অংশ পেছন থেকে দেখতে না পেয়েও দল যেদিকে যায় সেদিকেই যায়। একইভাবে সমাজের মানুষও পূর্ব-পুরুষরা যে সব রীতি-নীতি মেনে চলেছে তা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই সবাই তো আর ভুল করতে পারে না তা ভেবে অনুকরণ করে।
৫. সাধারণত ভিন্ন চিন্তার মানুষেরা সমাজে নিজেদের সংখ্যালঘু বা সংখ্যায় কম বলে মনে করে। আর অন্যদের সংখ্যায় বেশি বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মনে করে। শেষ পর্যন্ত নিজের রীতি-নীতি বদলে ফেলে অন্যদের রীতি-নীতি মেনে নেয়।
৬. অধিকাংশ মানুষ কেমন রীতি-নীতি পছন্দ করে সে সম্পর্কে মানুষ একটা অনুমান করে। প্রায়শই সে ধারণা ভুল হলেও সে সেই অনুমান অনুসারে রীতি-নীতি মেনে চলে।
৭. প্রচার মাধ্যমে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যে রীতি-নীতি মেনে চলে তা দেখে তরুণ প্রজন্ম সেটা দ্বারা প্রভাবিত হয়।
৮. সমাজ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের ওপর রীতি-নীতি মেনে চলার জন্য নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধ

পরদিন শ্রেণিকক্ষে এসে খুশি আপা বললেন, চলো আজ আমরা বই থেকে আরও কিছু ছবি দেখি। ক্লাসের সবাই মিলে নিচের ছবিগুলো দেখল।





ছবি দেখা শেষ হলে খুশি আপা সবাইকে দলে বিভক্ত হয়ে ছবিগুলো থেকে কী বোঝা গেল তা আলোচনা করে দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বললেন।

সবাই তখন দলে বিভক্ত হয়ে নিচের ছক ব্যবহার করে তাদের চিন্তাগুলো সাজিয়ে সবার সামনে উপস্থাপন করল।

ক্রম	ছবির শিরোনাম	ছবি দেখে যা মনে হয়েছে
১.	চারপাশটা পরিচ্ছন্ন রাখি সবাই মিলে ভালো থাকি (এটা একটি উদাহরণ)	সবাই মিলে সমাজের কাজগুলো করলে সবাই মিলে ভালো থাকা যায়। (এটা একটি উদাহরণ)
২.		
৩.		

সবার উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, তোমাদের সবার কথা থেকে বোঝা গেল যে ছবিতে কিছু সামাজিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে কোনো ব্যক্তি বা একদল মানুষ কিছু কাজ করেছে। আচ্ছা বলো তো, ছবিতে যে সব কাজ দেখানো হয়েছে সেগুলো কি ভালো না মন্দ? সবাই বলল, ভালো!

খুশি আপা বললেন, কেউ যদি এই কাজগুলো করে তাহলে আমরা তাকে কেমন মানুষ বলে মনে করি? ওরা বলল, ভালো মানুষ। খুশি আপা বললেন, ভালো মানুষের কী কী বৈশিষ্ট্য ছবিগুলোয় দেখতে পাচ্ছি? ‘সামাজের সেবা করা, দয়া, মায়া, পরোপকার, সহযোগিতার মনোভাব’ ওরা জবাব দিল। এবার খুশি আপা ভালো মানুষের আর কী কী বৈশিষ্ট্য হয় তা জানতে চাইলেন। জবাবে ওরা নানা রকম বৈশিষ্ট্যের কথা বলল।

খুশি আপা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আমরা জানলাম কীভাবে যে এগুলো ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য?

সবাই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। একটু পর বুশরা বলল, বড়দের কাছ থেকে জেনেছি। আমার বাবা তো প্রায়ই আমাকে বলে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, মানুষের উপকার করবে। এবার আশ্তে আশ্তে সবাই মুখ খুলতে শুরু করল। শফিক বলল, আমার খালা আমাকে বলেছে রাস্তায় যদি কোনো অসহায় মানুষ দেখো, তাহলে তাকে সাহায্য করবে।

খুশি আপা বললেন, তার মানে আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী বা সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে এগুলো ভালো কাজ। দেখা যাচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে ভালো কাজ হিসেবে মনে করছে। সবাই সহমত হলো।

খুশি আপা বললেন, এবার চলো আমরা পরিবারে ও সমাজে ভালো কাজ হিসেবে মনে করা হয়— এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করি এবং এসব ভালো কাজ করার পেছনে যে নীতিগুলো থাকে সেগুলো খুঁজে বের করি।

ক্রম	সমাজস্বীকৃত ভালো কাজের নমুনা	নীতি
১.	বয়স্ক ব্যক্তিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা	পরোপকার
২.	অন্যের মতামত মেনে নিতে না পারলেও শ্রদ্ধাসহ শোনা	পরমতসহিষ্ণুতা
৩.	অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া	
৪.		
৫.		

ওরা সবাই মিলে অনেকগুলো ভালো কাজের সমাজ স্বীকৃত নীতি খুঁজে বের করল। খুশি আপা বললেন, এই যে নীতিগুলো যার মাধ্যমে আমরা কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ তা বুঝতে পারি তাকে ‘মূল্যবোধ’ বলা হয়।

মূল্যবোধ

সমাজস্বীকৃত যেসব নীতিমালা সাধারণভাবে সমাজের মানুষকে কোন কাজ সঠিক আর কোন কাজ ভুল, সে সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ মানুষকে সমাজ জীবনে কোন বিষয়গুলো মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে শেখায়।

এই মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে আমরা সমাজ কী গ্রহণ করবে ও করবে না সে সম্পর্কে জানতে পারি। মূল্যবোধগুলো সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সমাজ বিভিন্নভাবে মানুষকে এসব নীতির সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত করায়। নানা সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুলো আমরা সেখানকার প্রচলিত নানান কথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে খুঁজে পাই। আফ্রিকার কিছু প্রবাদ শোনা-

আফ্রিকার প্রবাদ

- যে নির্দেশ মানতে চায় না, সে নেতৃত্ব দিতেও পারে না।
- সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।
- যদি দূত যেতে চাও তাহলে একা হাঁটো, আর যদি দূরে যেতে চাও তাহলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে আগাও।

চীন দেশের কিছু প্রবাদ

- যে ফুল উপহার দেয় তার হাতে কিছুটা সুগন্ধ লেগে থাকে।
- কাউকে একটা মাছ দেওয়ার মানে তুমি তাকে এক দিন খেতে দিলে, কাউকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিলে তুমি তাকে সারা জীবন খাবার সুযোগ করে দিলে।
- তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তাহলে সে কাজ কখন করো না।

আমাদের দেশেও এ রকম প্রবাদবাক্য আছে

- দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
- ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
- সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।

ওরা প্রবাদবাক্যগুলোর অর্থ এবং এর মধ্যকার মূল্যবোধ নিয়ে দলে আলোচনা করল। কোনোটায় পারস্পরিক সহযোগিতা, কোনোটায় সময়ানুবর্তিতার মূল্যবোধের কথা বলা হয়েছে। মিলি বলল, দাবুণ মজার তো! আমরা যদি নানান দেশের প্রবাদবাক্যগুলো জানতে পারি, তাহলে সেই সমাজের মূল্যবোধগুলো সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব।

প্রবাদবাক্য	মূল্যবোধ
সংকটের সময় বুদ্ধিমানরা সঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেওয়াল।	পারস্পরিক সহযোগিতা
তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তবে সে কাজ কখন করোনা।	সততা
দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।	একাত্মতা

এরপর খুশি আপা ওদের দলে ভাগ হয়ে বিদেশে থাকা পরিচিতজন, ইন্টারনেট, আশপাশের মানুষ, বিভিন্ন বই ইত্যাদি উৎস থেকে প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে এর মধ্যকার মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করতে বললেন। ওরা কাজটি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

চলো, আমরাও ওদের মতো বিভিন্ন উৎস থেকে নানান দেশের প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করে উপস্থাপন করি।

উপস্থাপনা শেষ হলে খুশি আপা বললেন, আমি খুবই খুশি হয়েছি যে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ খুঁজে বের করতে পেরেছি। আমরা বেশ কিছু মূল্যবোধ খুঁজে বের করেছি যা আমাদের সমাজে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হচ্ছে-

সংহতি, দেশপ্রেম, পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, শ্রদ্ধা, সততা, মতো প্রকাশের স্বাধীনতা, পরোপকার, দয়া, শুদ্ধাচার প্রভৃতি

মামুন বলল, কিন্তু আপা আমার তো রীতি-নীতি আর মূল্যবোধ অনেকটা একই রকম মনে হচ্ছে!

বুপা বলল, আমার মনে হয়, সামাজিক রীতি-নীতি কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে কী আচরণ করতে হবে তা জানতে সাহায্য করে। যেমন- হাঁচি-কাশির সময় মুখে রুমাল অথবা টিস্যু দেওয়া কিংবা কনুই চেপে ধরা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ইত্যাদি। আর মূল্যবোধ সাধারণভাবে কোন কাজ বা আচরণ ভালো আর কোনটা খারাপ সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। যেমন- সততা, পরোপকার ইত্যাদি।

খুশি আপা বললেন, একদম ঠিক বলেছ! নিচের সারণি থেকে আমরা দেখে নিই সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য কী।

ক্রম	সামাজিক রীতি-নীতি	মূল্যবোধ
১.	কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষ কীভাবে আচরণ করবে তার আদর্শ।	কিছু নীতিমালা যা কোনো একটি সমাজের মানুষের জন্য কোন ধরনের আচরণ বা কাজ মূল্যবান বা ভালো আর কোন ধরনের আচরণ মন্দ তা বুঝতে সাহায্য করে।
২.	কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট আচরণের নির্দেশনা।	আচরণের সাধারণ নীতিমালা।
৩.	সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত আচরণ।	কোনো একজন ব্যক্তির মেনে চলা নীতি বা বিশ্বাস।
৪.	একেক সমাজে একেক রকম রীতি-নীতি দেখা যায়।	একেক ব্যক্তি একেক রকম মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়।
৫.	উদাহরণ:	

কারো সাথে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, হাঁচি-কাশি দেবার সময় মুখে হাত দেওয়া, কারো সাথে ধাক্কা লেগে গেলে দুঃখ প্রকাশ করা প্রভৃতি।

উদাহরণ:

সততা, সাহস, দয়া, শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি।

খুঁজে দেখি রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ

খুশি আপা বললেন, আমরা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নানা রকম রীতি-নীতি আর মূল্যবোধের দেখা পাই। অরিত্রর গল্পটা থেকে চলো আমরা বিষয়টা আরো একবার বোঝার চেষ্টা করি।

স্কুলের প্রথম দিন

অরিত্র আজ প্রথম স্কুলে যাবে। মা ওকে সকাল থেকে তৈরি করছেন আর নানা রকম উপদেশ দিচ্ছেন। বলেছেন স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়ির বড়দের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে। স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের সালাম দিতে। অরিত্র দাদিকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার পর দাদি ওকে বিশ টাকার একটা নোট দিলেন। আর বললেন, দোয়া করি, অনেক বড় হও। তখনি টিকটিকিটা টিকটিক করে উঠল। দাদি তখনই বললেন, ঠিকঠিকঠিক আর আঙুল দিয়ে টেবিলে তিনবার টোকা দিলেন। দাদিও অরিত্রকে উপদেশ দিলেন, স্কুলে ভদ্র আর শান্ত হয়ে থাকবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করবে না। টিফিনের কৌটা ব্যাগে ভরতে ভরতে মা বললেন, বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ো। জিনিসপত্র ডান হাত দিয়ে দেওয়া-নেওয়া করবে। বাম হাত দিয়ে কাউকে কিছু দিও না। এতসব নিয়ম-কানুনের কথা শুনে অরিত্রর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। বাবার সঙ্গে বের হওয়ার আগে অরিত্র সবাইকে বিদায় জানাল। দরজা থেকে বের হওয়ার সময় বাবা বললেন, ডান পা আগে দাও। স্কুলে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বাবাও ওকে যতটা সম্ভব উপদেশ দিলেন। অরিত্রর ভয়টা আরও বেড়ে গেল। স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকান সময় দারোয়ার চাচা ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। ওর তক্ষুনি স্কুলটাকে খুব আপন লাগতে শুরু করল।

খুশি আপা বললেন, চলো, আমরা খুঁজে দেখি এই গল্পের মধ্যে কী কী রীতি-নীতি আর কী কী মূল্যবোধ খুঁজে পাই।

রীতি-নীতি	মূল্যবোধ

চলো, আমরাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন

আজ গণেশকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার খুব মন খারাপ। খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আজ কী হয়েছে? গণেশ জানাল, ওদের বাড়ির কাছে তিন বছরের একটা ছেলে খেলতে খেলতে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। একটা গাড়ির ধাক্কায় সে মারাত্মক আহত হয়েছে। গণেশের বাবা হাসপাতালে গিয়েছিলেন ছেলেটাকে রক্ত দিতে। বাবার কাছে ও জেনেছে, ছেলেটা খুব কষ্ট পাচ্ছে। খুশি আপা জানতে চাইলেন, এত ছোট ছেলেটা রাস্তায় চলে গেল, কেউ খেয়াল করেনি? ওর বাবা-মা বড় দুই ভাই-বোনের কাছে ওকে রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা কেউ দরজা বন্ধ করেনি। ভাই ভেবেছে বোন বন্ধ করবে, বোন ভেবেছে ভাই করবে। এমনকি ছোট ভাইটা যে কোথায় আছে, সেটাও কেউ খেয়াল করেনি। দুজনই ভেবেছে, অন্যজনের কাছে আছে।



ঘটনাটা শুনে ক্লাসের সবার খুব মন খারাপ হলো। সাবা বলল, ওর ভাই-বোনদের মূল্যবোধের অভাব আছে বলে মনে হচ্ছে। “মানে?” মামুন জানতে চাইল। “ওদের একটু দায়িত্ববোধ থাকলে এ রকম ঘটনা ঘটত না” সাবা বলল। আনাই বলল, দায়িত্ববোধ নেই— এমনটা নাও হতে পারে। হয়তো এটা কেবল একটা ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু তার ফল হয়েছে মারাত্মক। অন্তেষা বলল, ওদের কার কী দায়িত্ব সেটা যদি ভাগ করা থাকত, কে দরজা বন্ধ করবে, কে ভাইয়ের খেয়াল রাখবে, তাহলে এই দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত। খুশি আপা বললেন, অন্তেষার এই কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ! সবাই এ বিষয়ে সহমত হলো যে, পরিবারে বা দলে দায়িত্ব ভাগ করা থাকলে কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে হয়। গৌতম বলল, আপা, আমাদের ক্লাবগুলোতে কমিটি তৈরি করে, কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করা আছে বলেই আমরা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি। মিলি বলল, কিন্তু আমাদের কমিটিগুলোর মেয়াদ প্রায় শেষ হতে চলল। নতুন করে কমিটি করা দরকার।

সেদিনই ঠিক হলো, শুরুতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটি নির্বাচন হবে। দিন-তারিখও ঠিক হলো। ঠিক হলো ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই কমিটি হবে। নির্বাচনে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সবার আলোচনার ভিত্তিতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি হলো। নির্বাচনে কে কোন পদে মনোনয়ন চায়, তাদের নামেরও তালিকা হলো।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটির সদস্য পদের তালিকা
সভাপতি:
সহ-সভাপতি:
সাধারণ সম্পাদক:
কোষাধ্যক্ষ:
..... সম্পাদক:
..... সম্পাদক:
..... সম্পাদক:
সদস্য ১:
সদস্য ২:
সদস্য ৩:
.....

খুশি আপা বললেন, নির্বাচন যে হবে, তার আয়োজন করবে কে? নির্বাচনের আয়োজন করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হলো। যার নাম দেওয়া হলো নির্বাচন কমিশন। তারা নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করল। ক্লাসের সবার নাম লিখে ভোটের তালিকা তৈরি করল। নির্বাচনের নিয়ম-কানুনও তৈরি করল। যার নাম হলো নির্বাচনী আচরণবিধি।

চলো, আম নির্বাচনী আচরণবিধি
<ul style="list-style-type: none"> ● এমনভাবে প্রচারণ করতে হবে যেন শ্রেণি কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় ● নির্ধারিত জায়গার বাইরে পোস্টার লাগানো যাবে না ● প্রত্যেক শিক্ষার্থী কেবল একটি করে ভোট দিতে পারবে। রাও ওদের মতো কাজটি করি

নির্বাচন ঘিরে সারা স্কুলে একটা উৎসবের আমেজ! এবারের নির্বাচনে তিনটি প্যানেল অংশ নিচ্ছে। তাদের সুন্দর সুন্দর সব স্লোগান তৈরি হয়েছে।



নির্বাচনের জন্য পোস্টার, স্লোগান তৈরি, প্রচার-প্রচারণার জন্য গান গাওয়া, বক্তৃতা করায় সবার খুব উৎসাহ! নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলো নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারও বানিয়েছে। তাদের প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হলে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য কী কী কাজ করা হবে তার বর্ণনা এই ইশতেহারে লেখা আছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি লিখে প্লাকার্ডও বানানো হয়েছে। টিফিনের সময় প্লাকার্ড হাতে মিছিল হয় রোজ।



স্কুলের ছোট-বড় সবার মুখে পুঁথির সুরের এই নির্বাচনী গান,

শোনো শোনো বন্ধুরা সব, শোনো দিয়া মন,

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের হবে নির্বাচন

সবার ভোট সফল হবে এমন আয়োজন।

সঠিক লোকের সঠিক পদে থাকা প্রয়োজন

চিন্তা করে ভোট দিয়ো তাই সুখী সর্বজন।

অবশেষে নির্বাচনের দিন এসে গেল। ওই দিন নির্বাচন কমিশন প্রচার-প্রচারণা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তারা প্রার্থীর প্রতীকসহ ব্যালট পেপার তৈরি করেছে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব নির্বাচন		
প্রার্থীর নাম	প্রতীক	সিল দেওয়ার স্থান
ক		
খ		
গ		

সবার মনেই আজ উৎসবের আনন্দ! শতভাগ ভোট পড়েছে! আজ সপ্তম শ্রেণির কেউ অনুপস্থিত নেই। সবাই সক্রিয় নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।

ভোটগ্রহণ শেষ হলে স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় ভোট গণনা করা হলো। এক একজন বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়, আর সবাই আনন্দে চৈঁচিয়ে ওঠে। সবার নাম ঘোষণার পর বিজয়ীদের অভিনন্দন জানানো হলো। সুন্দর একটা নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষকগণ ওদের প্রশংসা করলেন।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

চলো আমরাও ওদের মতো নিচের ধাপ অনুসরণ করে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের নির্বাচনের আয়োজন করি।

- সবার আলোচনার ভিত্তিতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করা
- বিভিন্ন পদপ্রার্থীর একাধিক প্যানেল তৈরি করা
- নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের নির্বাচনের নিয়ম-কানুন ও ব্যালট পেপার তৈরি করতে দেওয়া, নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশনকে সহযোগিতা করা
- স্লোগান, ইশতেহার, পোস্টার, প্লাকার্ড, গান ইত্যাদি তৈরি করে নির্বাচনী প্রচারণা করা
- নির্বাচন অনুষ্ঠান করে, ভোট দিয়ে কমিটি নির্বাচন করে, কমিটির সদস্যদের নাম নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া



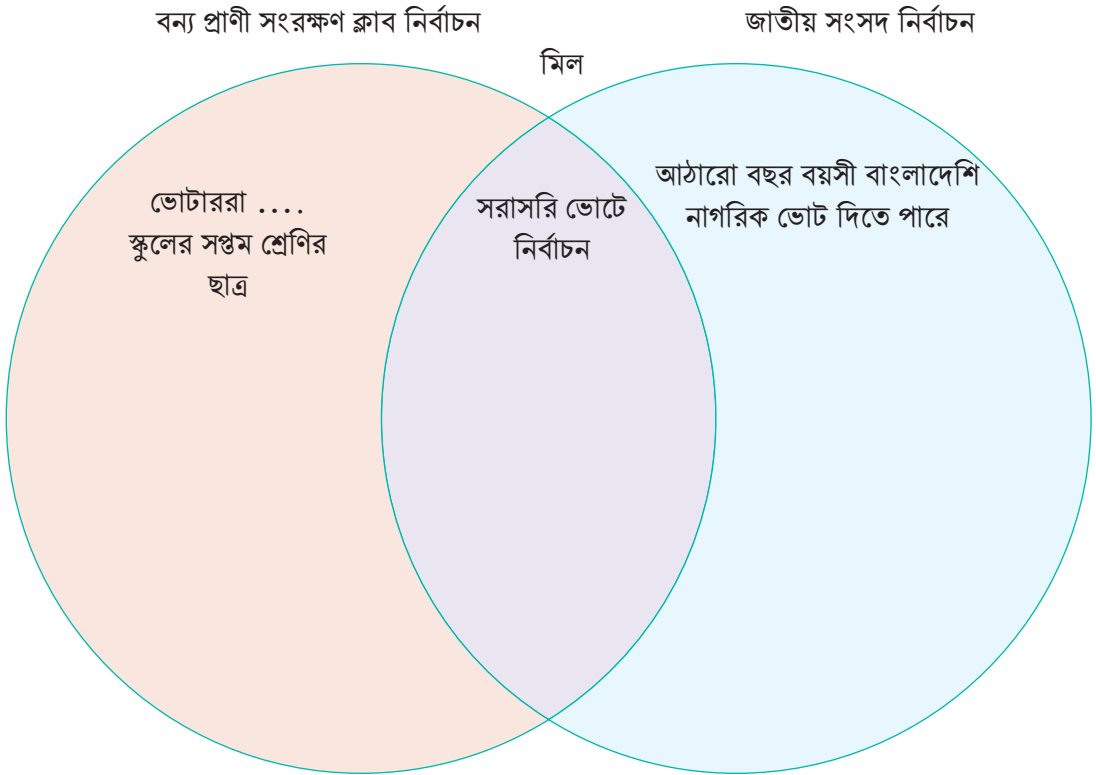
খুশি আপা বললেন, আমরা যেভাবে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটি নির্বাচন করেছি, বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচনও এভাবে হয়। বাংলাদেশের আইনসভাকে ‘সংসদ’ বলা হয়। তবে আমাদের নির্বাচন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে কিছু তফাতও আছে। সংসদ নির্বাচনে

- ভোট দিতে পারে কমপক্ষে আঠারো বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকরা
- রাজনৈতিক দল থেকে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়
- বাংলাদেশকে তিন শত আসনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি আসন থেকে একজন করে মোট ৩০০ জন সংসদ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসনে পঞ্চাশজন নারী সাংসদকে নির্বাচন করেন তারা রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করেন প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি

মাহবুব জানতে চাইল, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্লাব কমিটি গঠন করে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করব। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কী হয়? জবাবে খুশি আপা বললেন, সংসদ অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের বাছাই করা হয়।

অশ্বেষা বলল, চলো, আমরা প্রথমে পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন বই, ইন্টারনেট, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজ করি। মিল-অমিলের ছক ব্যবহার করে দেখতে পারি আমাদের ক্লাবের নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল আছে।

খুশি আপা বোর্ডে নিচের ছকটি আঁকলেন। বললেন, ছকের বামদিকে আমরা আমাদের নির্বাচন নিয়ে লিখব আর ডানদিকে লিখব জাতীয় নির্বাচনের কথা। আর যে বিষয়টি দুই নির্বাচনেই এক রকম সেটি বসাব মাঝখানে। এ রকম ছককে ‘ভেন রেখাচিত্র’ বলে।



চলো, আমরাও ওদের মতো দুটো নির্বাচনের মধ্যকার মিল-অমিলের ছকটি পূরণ করি।

সালমা বলল, সংসদ নির্বাচন আর আমাদের নির্বাচনের মধ্যে যত তফাতই থাক, একটা মিল কিন্তু দারুণ! দুই জায়গায়ই ভোটারের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। তাতে সবার মতামত দেওয়ার সুযোগ হয়। সেই প্রার্থীরা সবার পক্ষ থেকে সংসদে কথা বলছে। অর্থাৎ সবারই মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ছায়া সংসদে ‘পথের প্রাণী’ বিষয়ক আইন

আনুচিং বলল, আমি খবরে দেখেছি, নওগাঁর পাহাড়পুর জাদুঘর এলাকায় কিছু শিয়াল আছে। শিয়াল তো এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। ওই জাদুঘরের কাস্টডিয়ান ফজলুল করিম আরজু তার সহকর্মীদের নিয়ে শিয়ালগুলোকে প্রতিদিন খাবার দেয়। বাচ্চা শিয়ালদের দেখেশুনে রাখে। ফাতেমা আনাইয়ের কথায় সায় দিতে যাচ্ছিল, এরমধ্যে গৌতম বলল, শিয়াল খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল! শিহান বলল, শিয়াল না পাই, পথে পথে তো অনেক অসহায় কুকুর থাকে। ওদের খাবার, আশ্রয়, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা ওদের জন্য কাজ করতে পারি। হাচ্চা বলল, আমাদের এলাকায় একটা বিড়াল থাকে। সে সবার বাড়ি থেকে খাবার চুরি করে খায়। সে জন্য লোকের হাতে মারও খায়। সেদিন পাশের বাড়ির একজন বলছিল, “ধরতে পারলে বিড়ালটাকে মেরেই ফেলব।” ওই বিড়ালটাকে কি আমরা রক্ষা করতে পারি? সালমা বলল, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে আমরা পথের বিড়াল-কুকুরদের সাহায্য করতে পারি। সুমন বলল, আমাদের পাশের বাড়িতে একটা পাখিকে খাঁচায় আটকে রেখে বাড়ির লোকজন বেড়াতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে পাখিটা মরে গিয়েছে। আমরা খাঁচার পাখিদেরও রক্ষা করতে পারি। গণেশ বলল, পথের বিড়াল-কুকুর নোংরা জিনিসপত্র খায়, ওরা জীবাণু ছড়ায়। সুযোগ পেলে কামড়েও দিতে পারে। আমরা বরং খাঁচার পাখিকে বাঁচাতে কাজ করি। গণেশের কথায়ও কয়েকজন সায় দিল।

খুশি আপা যখন ক্লাসে এলেন, তখনও তর্কটা চলছে। খুশি আপা বললেন, আমরা তো ক্লাবের মাধ্যমেই এই সংকটের সমাধান করতে পারি! শফিক বলল, আপা, আমরা কোন কাজটা করব সেটা জানা থাকলে ক্লাব কাজ করতে পারত। কিন্তু পথের কুকুর-বিড়ালকে নিয়ে কাজ করব নাকি খাঁচার পাখি— সেই সিদ্ধান্তই তো এখনও নিতে পারিনি। খুশি আপা বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন দেখেছ? আমরা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদের আদলে ‘ছায়া সংসদ’ তৈরি করতে পারি। সেখানে পথের কুকুর বিড়ালকে আমরা সাহায্য করব নাকি খাঁচার পাখি, সেই বিষয়টি বিল আকারে আসতে পারে। ওরা দারুণ উৎসাহ প্রকাশ করল। খুশি হয়ে খুশি আপা বললেন, এবার তাহলে সংসদে বসে আমরা নতুন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের এই শ্রেণিকক্ষই হবে আইনসভা।

ক্লাব নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সাধারণ সম্পাদককে করা হলো রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ক্লাবের নির্বাচিত সভাপতিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাব নিয়োগ দিল। প্রধানমন্ত্রী আইনমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রমুখ মনোনয়ন করল। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিল। একজন স্পিকারও নিযুক্ত হলো। বিজয়ী প্যানেলের বাকিরা সরকারী দলের সাংসদ আর অন্যরা বিরোধী দলের সাংসদ হলো। সাবা বলল, বাহ! আমরা তো সরকার তৈরি করে ফেললাম!

কয়েকজন সংসদ সদস্য মিলে আলোচনার ভিত্তিতে “বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব যে-কোনো গৃহহীন প্রাণীকে সাহায্য করবে, এমনকি যদি কোনো মানুষ তার পোষা প্রাণীর ঠিকমতো যত্ন না নেয়, সেক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেবে” এই মর্মে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করল। এরপর বিরোধী দলের একজন সদস্য আইনের খসড়াটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করল। সরকারী ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল। সবশেষে স্পিকার মৌখিক ভোটের আয়োজন করল। কণ্ঠভোটে “হ্যাঁ” জয়যুক্ত হলো। আইনটি লিখিতভাবে পেশ করা হলে রাষ্ট্রপতির তাতে স্বাক্ষর করল। এভাবে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের একটি আইন তৈরি হলো।

আইনটি প্রণীত হওয়ার পর পথের কুকুর-বিড়াল কিংবা খাঁচার পাখি—কাউকে নিয়ে কাজ করতেই ওদের আর কোনো বাধা থাকল না। তবে আইনে একটি শর্তও রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বড়দের পরামর্শ নিতে হবে এবং সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এরপর ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সারা বছর কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	এলাকায় যাদের সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে	কোন এলাকায় কাজটি করা হবে	সময়কাল
	বন্য প্রাণীদের আবাস ও খাবারের প্রাকৃতিক উৎস নিশ্চিত করার জন্য গাছ লাগানো				
	বাড়ির বাড়তি খাবার পথের প্রাণীদের দেওয়ার জন্য প্রতিটি বাড়ির সামনে একটি করে পানির পাত্র ও খাবারের পাত্র রাখা				
	শিশু ও অসুস্থ প্রাণীদের জন্য সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা				
	পশু চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে বিনা খরচে/স্বল্প খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা				
	পথের প্রাণীদের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ দূর করতে ও খাঁচার পাখিকে অবমুক্ত করতে জনসচেতনামূলক পোস্টার তৈরি করা				
	খাঁচার পাখি যারা বিক্রি করে তাদের এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা				

চলো আমরাও ওদের মতন ছায়া সংসদে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ নিয়ে আইন প্রণয়ন করি এবং ওদের সুরক্ষার জন্য উপরের ছকটি ব্যবহার করে নিজেদের পরিকল্পনা তৈরি করি।

সরকারের বিভাগসমূহ

নীলা বলল, আমরা তো সরকার গঠন করলাম, আইনও তৈরি করলাম, কিন্তু আইন যদি কেউ না মানে তাহলে কী হবে?

খুশি আপা বললেন, সরকার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে। খুশি আপা ওদের একটা পোস্টার দেখালেন।

আইন বিভাগ: আইন তৈরি ও সংশোধন করে। দেশের সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব করে বাজেট তৈরি করে।

শাসন বিভাগ: রাষ্ট্রের মধ্যে আইনকে প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের স্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ করে।

বিচার বিভাগ: কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার করে

খুশি আপা এবার ওদের আর একটা পোস্টার দেখালেন। জানতে চাইলেন, কী দেখতে পাচ্ছ? “সরকার যেমন একটা প্রতিষ্ঠান, সে আবার আলাদা আলাদা তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। “সরকার নিজেও আর একটা প্রতিষ্ঠানের অংশ। সেটি হলো রাষ্ট্র বা দেশ। ” রূপা বলল। খুশি আপা বললেন, দারুণ বলেছ!

খুশি আপা তখন ওদের আরও কিছু ছবি দেখিয়ে বললেন, একটা রাষ্ট্র তৈরি হতে গেলে এই উপাদানগুলো লাগে।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

- একটা রাষ্ট্র হতে হলে সরকারের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, জনগণ আর সার্ব (বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা)।
- রাষ্ট্র তার সব ইচ্ছা বা কাজ সরকারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে।
- সাধারণভাবে রাষ্ট্রকে কোথাও দেখা যায় না।
- কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে, যখন অন্য যে কোনো রাষ্ট্র বা শক্তির নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জনগণের ওপর আইন প্রয়োগ করে বা জনগণের কল্যাণ করার জন্য বিভিন্ন কাজ করে তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়।
- রাষ্ট্র একটি ভূখন্ডের জনগণের সবার ইচ্ছায় গড়ে তোলা একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ।

প্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধ

খুশি আপা জানতে চাইলেন, নির্বাচন আর ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা কেমন লাগল? ওরা বলল, আমাদের খুব ভালো লেগেছে! দারুণ মজা হয়েছে!! আচ্ছা, আমরা যে নির্বাচন করলাম, সরকার গঠন করলাম, ছায়া

সংসদে বিল পাস করলাম, সেখানেও কি মূল্যবোধ, রীতি-নীতি কাজ করেছে? খুঁজে দেখি। ওরা খুঁজে বের করে একটা তালিকা তৈরি করল।

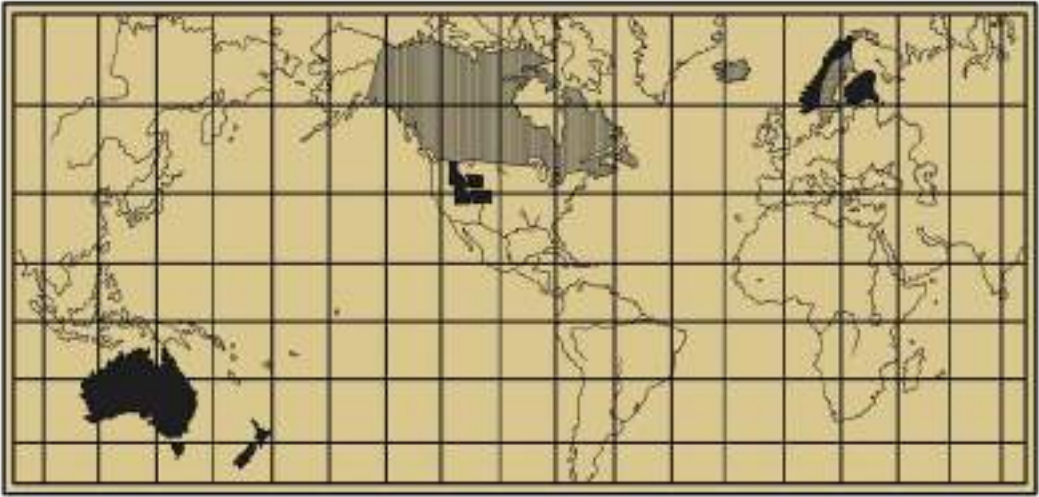
সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রীতি-নীতি মূল্যবোধ

ক্রম	কাজের বিবরণ	দায়িত্বশীল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম	সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের নাম
১	অন্যকে মতো প্রকাশ করতে দেওয়া	গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
২	নিজের মতো প্রকাশ করা
৩	সবার মতকে সম্মান করা
৪	অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা	
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			
১১			

ওপরের ছক ব্যবহার করে আমরাও আমাদের নির্বাচন, ছায়া সংসদের অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত কাজ থেকে পাওয়া মূল্যবোধগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি।

সালমা বলল, কিন্তু আপা, টেলিভিশনের সংসদ অধিবেশনে আমরা দেখেছি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা কথা বলেন। আমাদের ছায়া-সংসদে তো কোনো সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিল না! খুশি আপা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সংসদে যদি কোনো মেয়েই না থাকত তাহলে কেমন হতো? ওরা সবাই বলল যে, ব্যাপারটা মোটেও ভালো হতো না। “কেন ভালো হতো না?” খুশি আপার প্রশ্ন। ওরা বলল, কেবল ছেলেরা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, মেয়েরা পাবে না, এটা অন্যায়। ছেলে-মেয়ে সবারই সবকিছুতে সমান অধিকার আছে ইত্যাদি। “আমার তো মনে হয়, মেয়েদের ভোট দেওয়ার অধিকারই থাকা উচিত না” খুশি আপা বললেন, খুশি আপার কথা ওরা কেউ মেনে নিতে পারল না। সবাই মিলে তর্ক জুড়ে দিল। খুশি আপা জোড় দিয়ে বললেন, মেয়েরা ঘর-সংসার সামলাবে, দেশ কীভাবে চলবে সেটা দেখা তাদের কাজ না, তারা এতটা মেধাবীও না। তাদের রাজনীতিতে আসা একেবারেই উচিত না। ওরা খুশি আপার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল!

তারপর খুশি আপা হেসে বললেন, আজ থেকে এক-দেড় শ' বছর আগেও মানুষ এ রকমই মনে করত। তোমরা যদি সেই সময়ের মানুষ হতে, তাহলে আমার কথাকে পুরোপুরি ঠিক বলে মনে করতে।



১৯০৮ সালেও কেবল পৃথিবীর কালো চিহ্নিত অংশটুকু সমস্ত নারীদের ভোটাধিকার ছিল

একসময় অস্ট্রেলিয়ায় আইন অনুযায়ী কেবল যাদের গায়ের রং সাদা কেবল তারাই ভোট দিতে পারত। “এ রকম অদ্ভুত আইন কেন!” ওরা অবাক হলো। খুশি আপা বললেন, খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছে। আচ্ছা মনে আছে তো আইন কারা তৈরি করে? কীভাবে তৈরি করে?

সিয়াম বলে উঠল, আইনসভায় তৈরি হয়! আইনসভার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে!

গৌতম বলল, কিন্তু আইনসভার সদস্যরা তো সমাজের সবার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়! মানুষ তাহলে অমন প্রার্থীদের ভোট দিত কেন? সালমা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল, তার মানে কি তখনকার মানুষের সামাজিক রীতি-নীতি-মূল্যবোধও ঐ রকম ছিলো!! তখন খুশি আপা বললেন, চলো তাহলে আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক রামমোহন রায় এর জীবনীর অংশবিশেষ পড়ে দেখি মানুষের মাঝে সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে কাজ করে? আর কীভাবেইবা তা সময়ের সাথে বদলে যায়।



রামমোহন রায়

তোমরা হয়তো রামমোহন রায়ের নাম শুনেছ। তাঁকে বলা হয় প্রথম আধুনিক বাঙালি। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারে। প্রথমে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখলেও নিজের আগ্রহে ফারসি ও আরবি ভাষা শেখেন। এই দুই ভাষা তিনি এত ভালো রপ্ত করেছিলেন যে অনেকে ঠাট্টা করে তাঁকে ডাকতো ‘মৌলভী রামমোহন’।

তবে এই দূরদর্শী তরুণের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য ইংরেজি ভাষা শেখা জরুরি। ফলে রামমোহন

এক ইংরেজের কাছে ভালোভাবে ভাষাটি আয়ত্ত করেন। তিনি দেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে কাজ করেছেন।

এই সময় ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একটি অত্যন্ত অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিল। এটি হলো সতীদাহ বা সহমরণ। এই ব্যবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। রামমোহন এই প্রথাটি বন্ধে উদ্যোগী হন। তখন বাংলায় ইংরেজ শাসন চলছে, তাঁরা প্রথাটির বিরুদ্ধে থাকলেও এদেশীয় একটি প্রচলিত ব্যবস্থা বদলানোর উদ্যোগ নিজেরা গ্রহণ করতে দ্বিধাশিত ছিলেন। কিন্তু রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধে ইংরেজ শাসকের সহযোগিতা কামনা করেন।

এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেও রামমোহনের ভাবনায় এই প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী ভাব তৈরি হওয়ার পেছনে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কাজ করেছে। তাঁর দাদা জগমোহন রায়ের স্ত্রী ছিলেন অলকমণি দেবী। রামমোহন এই বউদিকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। দাদা জগমোহন অকালে মারা গেলে সামাজিক চাপে বউদি অলকমণিকে চিতায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হয়। তিনি নিজে সতী হতে চাননি। খবর পেয়ে রামমোহন বউদিকে বাঁচাবার জন্য ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছবার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি কেবল দেখলেন ঢাকের শব্দে, ধূনের ধোঁয়ায় পৈশাচিক আনন্দে জনতা চিৎকার করছে - জয় সতী অলকমণির জয়।



“বউদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন।”

এই ঘটনা তুলে ধরে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন- “বউদির চিতার পাশে পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। এক চোখে আগুন, আর এক চোখে জল নিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে যে-কোনো মূল্যে ভারতবর্ষ থেকে নারী হত্যার এই পৈশাচিক প্রথা তিনি চিরদিনের মতো লোপ করে দেবেন।”

দার্শনিক ও ভাবুক হলেও রামমোহন ছিলেন একজন বাস্তববোধসম্পন্ন কর্মী মানুষ। ফলে সেদিনের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে তিনি কাজ শুরু করলেন। শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়েই তিনি রচনা করলেন “সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ”। তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত প্রচার শুরু করে সামাজিক প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়। তবে রামমোহন উদারচিন্তের সাহসী মানুষ ছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময় ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল হিসেবে এসেছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সত্যনিষ্ঠার জন্যে রামমোহনকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগকে কেন্দ্র করে তখন হিন্দু সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনেক রাজা-মহারাজা এর বিরুদ্ধে থাকলেও কোনো কোনো শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর পক্ষে ছিলেন। ফলে রক্ষণশীল সমাজের ব্যাপক প্রচারগার মধ্যেও রামমোহনের জয় হলো। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়ে গেল। এ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়তো আরো কয়েক বছর সময় লেগেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ রকম একটি অমানবিক কুপ্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল।

সতীদাহ কী ধরনের সামাজিক বাস্তবতা তৈরি করত তার এক চিত্র পাওয়া যায়, কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘কেরী সাহেবের মুন্সি’তে। সেই অংশটুকু পড়লে আমরা এই প্রথা যে কতটা অমানবিক এবং নিষ্ঠুর ছিল তা বুঝতে পারব—

“এমন সময় অভাবিত এক কাণ্ড ঘটল।

তীরে কোলাহল উঠল - ‘গেল গেল, পালাল পালাল, ধর ধর!’



নৌকার আরোহীরা চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে যে তীরে একটি ছোটখাটো জনতা; কিন্তু কে পালাল কাকে ধরতে হবে, সে রহস্য উদ্ধার করার আগেই তারা দেখল নদীর জলে একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে

নৌকার দিকে আসছে। সবাই বুঝল তাকে ধরার উদ্দেশ্যেই কোলাহল। মেয়েটি নৌকার কাছে এসে পড়েছে এমন সময় খান দুই ডিঙি করে জন কয়েক লোক তাকে ধরার জন্য এগোল। কিন্তু ডিঙি তাকে ধরার আগেই মেয়েটি কেরীর বজরার কাছে এসে আত্মসমর্পণ বলে উঠল, বাঁচাও, বাঁচাও। ওরা পেলে আমায় পুড়িয়ে মারবে।

পরমুহূর্তে কেরীকে লক্ষ্য করে মেয়েটি বলে উঠল - সাহেব, দোহাই তোমার, আমাকে রক্ষা করো!

কেরীর ইজিতে রাম বসু মেয়েটিকে টেনে তুলে ফেলল নৌকায়।

সবাই দেখলে বিচিত্র তার বেশ, বিচিত্র তার সজ্জা, বিচিত্র তার রূপ। ভয়ে উদ্বেগে সে রূপ সহস্রগুণ উজ্জ্বল। প্রকৃত সৌন্দর্য্য দুঃখে সুন্দরতর হয়। ঝড়ের আকাশে চন্দ্রকলা মধুরতর।

তার বেশভূষা দেখে রাম বসু বলে ওঠে, এ যে দেখছি বিয়ের সাজ! তুমি কি বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসেছ?

রক্তিম ঠোঁটের ভজিতে গোলাপ ফুল ফুটিয়ে মেয়েটি বলে - বিয়ে কাল রাতে হয়েছে, আজ এনেছিল চিতায় পুড়িয়ে মারতে।

হতবুদ্ধি রাম বসু শুখায়, বর হঠাৎ মারা গেল?

হঠাৎ নয়, একটা মড়ার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিল, এখন বলে কি না ঐ মড়াটার সঙ্গে আমাকে পুড়ে মরতে হবে!

বহু যুগের সংস্কার, রাম বসু বলে ওঠে, চিতা থেকে পালাতে গেলে কেন?

চিরন্তন জীবনাগ্রহে মেয়েটির মুখ কথা বলে ওঠে - আমার মরতে বড় ভয় করে।

তারপরে একবার পেছন ফিরে দেখে কেরীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়ে বলে - সাহেব, রক্ষা করো - ওরা একবার ধরলে আর রক্ষা থাকবে না, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

ডিঙির আরোহীদের মধ্যে কৃশকায় একটি লোককে দেখিয়ে বলে - ঐ চণ্ডীখুড়ো সব নষ্টের গোড়া। দোহাই সাহেব, ওর হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ো না, দোহাই তোমার!

সমস্ত ব্যাপার দেখে কেরীর বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটির আত্মব্যাকুলতায় এতক্ষণে তার বাকস্ফূর্তি হলো - কেরী বলল, ‘তুমি ডরো মং, ঐ মিনসের হাতে তোমাকে আমি ছাড়ব না।’

সতীদাহ প্রথা বন্ধের আইনটি বিলেতের পিভি কাউন্সিলে পাশ হওয়ার আগে রক্ষণশীল নেতারা রামমোহনের প্রয়াসকে বাধা দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা রাজা-মহারাজা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসহ প্রায় আটশত বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদন পাঠিয়েছিলেন বিলেতে। কিন্তু রামমোহন স্বয়ং বিলেতে এসে ক্ষুরধার যুক্তিতে বিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডন করে আইনটি পাসের পথে সব বাধা দূর করেন।

রাজা রামমোহন রায়কে এ উপমহাদেশের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করার আরও অনেক কারণ রয়েছে। বিলেতে অবস্থানের সময় তিনি ইংল্যান্ডের রিফর্ম বা সংস্কার বিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অধিকারের পক্ষে অনেকগুলো সুপারিশ তুলে ধরেছিলেন। আইনসভার ইংরেজ সদস্যদের

অনেকে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষার প্রসারের বিশ্বাস করতেন। নারীদের জন্যে আধুনিক শিক্ষার আয়োজনেও তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। রামমোহন নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং মেয়েরা যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে তার পক্ষেও কাজ করেছেন। এছাড়া বাংলা গদ্যের সূচনাকারীদের অন্যতম একজন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন রায়ের জীবনী পড়া শেষ হলে ওরা দলগতভাবে নিচের ছক ব্যবহার করে সামাজিক রীতি-নীতি কীভাবে পরিবর্তন হলো তার প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লিখে উপস্থাপন করল।

কীভাবে সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তিত হয়?

এ পর্যায়ে খুশি আপা বললেন, আচ্ছা চলো তাহলে আমরা এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন করি। হর রে!! সবাই খুশি হয়ে উঠল। তারপর সবাই মিলে বিতর্কের বিষয় ঠিক করল।

বিতর্কের বিষয়

১. কেবল আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব সব মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
২. নারীর কাজ ঘর সামলানো আর পুরুষের কাজ রাষ্ট্র পরিচালনা
৩. সব মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই, কেবল বুদ্ধিমানের মতামতই শোনা উচিত।
৪.
৫.

বিতর্ক শেষে খুশি আপা যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মুক্ত আলোচনায় আহ্বান করলেন।

সে আলোচনায় ওরা সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আইন, সরকার— এসবের বদল নিয়ে মুক্ত আলোচনা করল।

আনাই বলল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় কত রকম বদল হয়! এই বদলগুলো হয় কী করে?

মিলি বলল, আমাদের এলাকায় একটা মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। ওর বাবা-মা রাজিও ছিল। কিন্তু মেয়েটার বয়স মাত্র পনেরো বলে বিয়েটা আর দেয়নি। কারণ ওর চাচা বাঁধা দিয়েছে। বলেছে, এখন বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। যখন আইনে বাধা ছিল না তখন অনেক ছোটবেলায় ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সিয়াম বলল, আচ্ছা, তাহলে তো আইন-কানুনও মূল্যবোধ ও রীতি-নীতিকে প্রভাবিত করে!

খুশি আপা বললেন, সমাজের অগ্রসরমাণ অংশের আন্দোলনের ফলেও মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়। আর চিন্তার পরিবর্তন থেকে রীতি-নীতি আর মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসে। অতীতকাল থেকেই অনেক মানুষ আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি আর মূল্যবোধের পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। তাঁরা চাপ তৈরির মাধ্যমে সমাজের অনেক রীতি-নীতিতে বদল এনেছেন বলে তাঁদের ‘চাপসৃষ্টিকারী’ গোষ্ঠীও বলা যায়।

আলোচনা শেষে ওরা ঠিক করল, বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনা এবং অতীত ইতিহাস থেকে সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ওরা অনুসন্ধানমূলক কাজ করবে। ওরা এই অনুশীলন বইয়ের “যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে?” অংশ থেকে শেখা পদ্ধতি অনুসরণ করল। প্রথমে তারা নিচের ছকে লিখিত প্রশ্নের মতো অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করল।

১. রাষ্ট্র, সরকার, আইন কীভাবে রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে
২. রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইনকে প্রভাবিত করে
৩.
৪.

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ও সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তারা তাদের অনুসন্ধানী কাজটি করল। এরপর ওরা বিষয় অনুযায়ী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করল।

অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমরাও ওদের মতো নিজেদের অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করে এ বিষয়ে অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করে উপস্থাপন করতে পারি।